লো ক ক থা

লো ক ক থা

প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৪

কার্বি লোককথা

মনফকিরা
www.monfakira.com

লো ক ক থা

প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৪

সম্পাদক : মানিক দাস ও সন্দীপন ভট্টাচার্য

এই সংখ্যার সংকলক : মানিক দাস

প্রচ্ছদের ছবি ও অন্যান্য গ্রাফিক্স : পলাক্ষী দাস

প্রকাশক : মনফকিরা-র পক্ষে চিত্রভানু চক্রবর্তী
২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১ নবোদিত, মুকুন্দপুর,
কলকাতা ৭০০ ০৯৯
বইপাড়ায় : ১৬ কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন : ৯১-৮৪২০৯-২৯১১১/ ৯১-৯৪৩৩৪-১২৬৮২/
৯১-৯৪৩৩১-২৮৫৫৫
ওয়েবসাইট : www.monfakira.com
ই-মেল : monfakirabooks@gmail.com/
monfakira.fakira@gmail.com/ monfakirabooks@yahoo.co.in
ব্লগস্পট : http://monfakira.blogspot.com
ফেসবুক : https://www.facebook.com/monfakira2013
গুগল প্লাস : https://plus.google.com/u/0/
111119619973026469315/posts

মুদ্রক : জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড,
কলকাতা ৭০০ ০০৯

৮০ টাকা

প ত্রি কা র প ক্ষে

লোককথা বা উপকথার প্রতি আমাদের প্রবল আকর্ষণ। পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠীর স্বকীয় যাপন-পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতার আলো-অন্ধকার ফুটে ওঠে লোককথার বিচিত্র আবহ আর রূপে। মুখে-মুখেই ছড়িয়ে পড়ে তা। বা বলা যায়, পাখির মতো ঘুরে বেড়ায় এদেশ-ওদেশ। লিখিত ঐতিহ্য শুরু হওয়ার অনেক আগেই ছড়িয়েছে এ সমস্ত গল্প। সম্ভবত ১৭ শতক থেকে ইউরোপীয় অভিযাত্রীরা দেশে-দেশে তাঁদের অভিযান-পর্বে এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ঔপনিবেশিক শাসকরা সাম্রাজ্যবিস্তার কালে সঙ্গে নেন পাদ্রি, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক আর শিক্ষিত উদারমনা আমলাদের। তাঁদের আগ্রহে-উৎসাহে বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য সংগৃহীত আর অক্ষরবন্দি হয়ে, এবং পরে ভাষান্তরের মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত মানুষের কাছে আসে। আজও তা অব্যাহত। লক্ষ করার ব্যাপার হল, লিখিত রূপে প্রকাশিত হওয়ার আগে মুখে-মুখে লোককথা ঘুরে বেড়াত বলে অনেক সময়ে একই গল্প বদলে গিয়ে অন্য রূপে অন্য কোথাও তার স্থানিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে। ফলে অনেক সময়ে বোঝা যায় না কোন্‌টা কার বা কোথাকার গল্প। লিখিত রূপে প্রকাশিত হওয়ার পরও সেই চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত। বস্তুত ব্যক্তি-স্বত্বের আওতামুক্ত পৃথিবীর যাবতীয় লোককথায় তাই সকলের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার।

লোককথার চিরকালীন আবেদনকে মনে রেখে ও ইদানীংকার পাঠকদের আগ্রহ লক্ষ করে আমরা এই পত্রিকার পরিকল্পনা করেছি। দেশ-বিদেশের নানা জনগোষ্ঠীর নানা রকম লোককথা ক্রমান্বয়ে ছাপা হবে এখানে। প্রতি সংখ্যায় এক বা একাধিক জনগোষ্ঠী বা বিশেষ কোন দেশের নির্বাচিত লোককথা থাকবে। সঙ্গে দেওয়া যাবে প্রাসঙ্গিক তথ্যও। প্রয়োজনে আরও কিছু। তবে সব-ই বিষয়নির্ভর।

এ সংখ্যায় যেমন আছে অসমের কার্বি জনগোষ্ঠীর পরিচিতি-সহ তাঁদের কিছু লোককথা। বলা বাহুল্য, পাঠকদের অনুগ্রহ আর আনকূল্যের ওপর নির্ভর করছে ‘লোককথা’র পথ চলা।

সূ চি

কার্বিদের পরিচয় ৯

বাপ-মরা ছেলে ও একটা পালকের কাহিনী ১৫

দুই অনাথ ভাইয়ের গল্প ১৭

বাঘ, ব্যাঙ আর শামুকের গল্প ২০

এক বুড়িমা ও তার শূকরের গল্প ২৩

চাক্কবিতিনি ২৬

সোনালি টিয়া ৩৩

পাতালের রাজকুমারী আর মর্ত্যের দরিদ্র কুমার ৩৮

পাখি আর ইঁদুর ৪৮

জামাইবাবাজির সওগাত ৫১

স্বাবলম্বী রাজপুত্র ৫৪

ভাই আর বোন ৫৬

বুড়ো-বুড়ির গল্প ৫৯

হার পাক কাং ৬৪

বন্য ফুটি আর সুন্দরী ৬৮

সার্পো কাথার ও হিংসুটে ডাইনি ৭৭

উপকারের ফল ৮৪

বুদ্ধিমতী বুড়ি ৮৬

কার্বিদের পরিচয়

কার্বিরা অসম-এর আদি জনগোষ্ঠীগুলোর অন্যতম। এঁরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ। এঁদের আগে মিকির বলা হত। মিকির শব্দটা বিতর্কিত এবং ইদানীং এর প্রয়োগ আপত্তিকর বলে মনে করা হয়। আদিকালে কার্বিরা থাকতেন অসমের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে-পাহাড়গুলো রয়েছে, তারই একটিতে। কার্বিরা তাকে বলেন, 'নং পিলার'। সেখান থেকে পরে নিম্নভূমির দিকে নেমে এসেছিলেন বলে তাঁরা মনে করেন। প্রথম দিকে তাঁরা থাকতেন, বা বলা ভালো, ছড়িয়ে পড়েছিলেন ডিমাপুর থেকে শুরু করে ডিফু পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায়। সে অঞ্চল তখন ছিল কছারি রাজাদের অধীনে। কছারি রাজারা তাঁদের ওপর নানা রকম অত্যাচার করতেন। অনেককে সে জন্য দেশছাড়া হতে হয়, অনেকে আবার ক্রীতদাস হয়ে ছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য বহু কার্বি জয়ন্তিয়া পাহাড়ে আশ্রয় নেন। কার্বিদের তখন খুবই দুঃখে দিন কাটত। পঞ্চদশ শতকে আহোমরা যখন অসমে রাজত্ব শুরু করেন, তখন থেকে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। তাঁদের আশ্রয়ে কার্বিরা কিছুটা মুক্তির স্বাদ পান এবং ক্রমে দল বেঁধে অসমের সমভূমির দিকে প্রব্রজন শুরু করেন।

পরবর্তী কালে বর্মি আক্রমণে আহোম রাজত্ব বিপর্যস্ত হয়। বর্মিরা অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল। বাড়িঘর ছেড়ে কার্বিরা উঁচু পাহাড়ে, নয়তো গভীর জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হন। (বর্মিদের হাত থেকে নিজেদের সম্ভ্রম বাঁচাতে কার্বি মেয়েরা সে সময়ে কপাল থেকে থুতনি অবধি একটা কালো দাগ কেটে নিজেদের মুখ কুৎসিত করে রাখত। এই দাগকে বলা হয় 'ডাক'।) সে সময়ে অনেকে উজান অসমের দিকে চলে যান, কেউ বা ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে উত্তর পাড়ে বসবাস শুরু করেন। এখন এই গোষ্ঠীর লোকেরা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছেন কারবি (মিকির) পাহাড়ে। সেখানে গঠিত হয়েছে স্বায়ত্তশাসিত কার্বি আংলং জেলা। তা ছাড়া এঁরা ছড়িয়ে আছেন অসমের গোলাঘাট, নগাঁও, দরং ও কামরূপে এবং মেঘালয়ের রি-ভোই জেলায়।

কার্বি ভাষা তিব্বতি-বর্মি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তিব্বতি-বর্মি ভাষাগোষ্ঠীর অধিকাংশ গোষ্ঠীর আদি বাস ছিল পশ্চিম চিনের ইয়াং-তি-কিয়াং ও হোআং-হো নদীর কাছে। সেখান থেকে তাঁরা অনেকে ব্রহ্মপুত্র, চিণ্ডুইন ও ইরাঅড্ডি নদী দিয়ে নেমে এসে ভারত ও ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। কার্বিরা ঐতিহাসিক প্রব্রজনের বিশেষ পর্বে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মধ্য এশিয়া থেকে এসে অসমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের প্রচলিত মৌখিক ইতিহাসে এর উল্লেখ আছে। কার্বি ভাষার নিজস্ব লিপি নেই। ইদানীং রোমান লিপিকে তাঁরা লেখার মাধ্যম হিসেবে নিয়েছেন। কার্বিরা পরম্পরাগত ভাবে প্রাপ্ত ও লোকমুখে প্রচলিত নিজস্ব লোকগীতি, লোককথা, প্রবাদ-প্রবচনে ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'সাবিন আলুন' নামে তাঁদের রামায়ণকথাও রয়েছে।

কার্বি শব্দের উৎপত্তি নিয়ে মিথ আছে। অনেক কাল আগে, সেই আদিম অবস্থায়, কার্বিদের এক পূর্বপুরুষ ঘরে 'মে' অর্থাৎ আগুন রেখে দোর বন্ধ করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী দূর থেকে তা দেখতে পান। তিনি ছুটে এসে তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'জ্বলন্ত আগুন না-নিভিয়ে আপনি কেন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন?' ('মে আকার সংহয় বি কাং কক?') তখন থেকে 'মে আকার বি' করার জন্য ঐ কথা থেকে তাঁদের গোষ্ঠীর নাম হয় কার্বি। কার্বিরা পাঁচটি কৌমে (কার্বি ভাষায় 'কুর') বিভক্ত— তেরান, তেরং, ইংঘি, ইংতি ও তিমুং।

কার্বিরা মূলত কৃষিজীবী। প্রধান খাদ্য ভাত। চাল থকে তাঁরা যে-মদ তৈরি করেন, তাকে বলা হয় সাজ। পুজো ও অন্যান্য উৎসব-অনুষ্ঠানে সাজ অপরিহার্য।

কার্বি মেয়েরা অসমিয়া মেয়েদের মতো মেখেলা চাদর পরেন (যদিও তাঁদের মেখেলা একটু উঁচুতে পরার নিয়ম)। কার্বি মেখেলার নাম 'পিনি' (পিনি সাধারণত কালো রঙের হয়ে থাকে।) আর মেখেলার সঙ্গে যে-চাদর পরা হয়, তাকে বলে 'পে-কক'। আর-এক ধরনের চাদরের নাম 'জারত্রক' বা 'জিস'। কোমরে তাঁরা পরেন 'বানপু' আর শীতকালে গায়ে চড়ান এঁড়ি চাদর 'খংজরি'। কানে বড় ছ্যাঁদা করে বড়-বড় অলংকার 'নংথেনপি' পরেন অনেক মেয়ে। পুরুষরা তাঁতে বোনা কাপড়ের জামা আর কোমরে লেংটি বা খাটো ধুতি 'রিংকিং' পরেন। মাথায় থাকে পাগড়ি 'পোহু'। কার্বি মেয়েদের বয়নশিল্পের বৈশিষ্ট্য চোখে লাগার মতো। ইদানীং তাঁদের সাজপোশাকে অসমিয়া সমাজের প্রভাব পড়েছে। এসেছে আধুনিকতা।

কার্বিরা যৌথ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সামাজিক বন্ধন খুব দৃঢ়। কোন কারণে বিবাদ দেখা দিলে সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠরাই বিচারের আসর বসিয়ে মিটমাট করে দেন। বিয়ের ব্যাপারে সামাজিক নিয়ম বেশ কঠোর। ছেলেমেয়েদের মেলামেশার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আছে। সাধারণত কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে, যেমন 'চমাংকান'

বা 'চমকান', সেখানে ছেলেমেয়েরা বিয়ের আগে মেলামেশা ও নাচগান করতে পারে। বহুবিবাহে সামাজিক সায় আছে, যদিও সাধারণত এক বিয়েতেই কার্বিরা অভ্যস্ত। কার্বি সমাজে বিয়ে-সংক্রান্ত রীতিনীতি অন্যান্য জনজাতির থেকে আলাদা। একই কৌমের ছেলেমেয়ের মধ্যে (বিশেষ করে মায়ের দিকের) যাতে বিয়ে হয়, সেদিকে নজর রাখা হয়। মায়ের ভাইয়ের ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে বিয়েকে উত্তম মনে করা হয়। বাবার ভাইয়ের ছেলেমেয়ে আর মায়ের বোনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। এদের ভাইবোন হিসেবে গণ্য করা হয়।

অসমের মরিগাঁও, কামরূপ, নগাঁও আর মেঘালয়ের রি-ভোই জেলার কার্বিরা নিজেদের বলেন 'দুম্‌রালি' অর্থাৎ সমতলের কার্বি। এঁদের সঙ্গে পাহাড়ি কার্বিদের কিছু পার্থক্য আছে। সমতলের কার্বিদের প্রধান সামাজিক উৎসব তিনটি : দোমাহি, মোনো কে-এন, রং কেহোম।

কার্বিরা ধর্মভীরু। হিন্দু ও খ্রিস্টান, উভয় ধর্মের লোকই তাঁদের মধ্যে আছেন। তবে নিজস্ব লোকধর্মাচরণে অভ্যস্তদের সংখ্যা বেশি। ২০০১ সালের লোকগণনা অনুসারে কার্বিদের মোট জনসংখ্যা ৩,৫৩,৫১৩। ধর্মীয় শ্রেণী-বিভাজন এ রকম— নিজস্ব লোকধর্মে বিশ্বাসী ৭০%, হিন্দু ১৪.৬৪%, খ্রিস্টান ১৫%, অন্যান্য ০.৩৬%।

হিন্দু ও লোকধর্মে বিশ্বাসী কার্বিরা বহু দেবতার উপাসক। পুনর্জন্মে বিশ্বাস থাকায় তাঁদের সমাজে পূর্বজদের নামে নবজাতকের নামকরণ করার রীতি আছে। মনে করা হয় নবজাতকের মধ্যে প্রয়াত ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয়। কার্বিদের লোকবিশ্বাস মতে মৃত ব্যক্তি পরলোকে কিছু কাল কর্মফল ভোগ করার পর পুনরায় নিজের গোষ্ঠীর কোন বংশে বা গোত্রে বিপরীত লিঙ্গের মানবসন্তান হয়ে জন্ম নেন। প্রসঙ্গত, তাঁদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে বলে 'চমাংকান' বা 'থি কার্হি'। এই অনুষ্ঠান প্রায় উৎসবের রূপ নেয়। সাধারণত একজন মারা যাবার ঠিক পরেই যে এই অনুষ্ঠান করতে হয়, তা নয়। সময়-সুবিধে অনুযায়ী তা পরেও করা যেতে পারে। লাগাতার চার দিন চার রাত্রির সংস্কার অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উপস্থিত থাকেন। তাঁরা আসেন তাঁদের নিজস্ব পরম্পরাগত পোশাক পরে। অন্য গ্রামের লোকেরাও সেখানে সাদর অভ্যর্থনা পান। চমাংকানের প্রথম দিনটিকে বলা হয় রু-কেহুম। সেদিন হাতে ঢোল-বাঁশি আর ঢাল-তলোয়ার নিয়ে নাচ-গান করা ছাড়াও খড় দিয়ে তৈরি মৃত ব্যক্তির প্রতিরূপে তাঁর অস্থি যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন 'কানহু' বা ছোট নাচের অনুষ্ঠান। তৃতীয় দিন 'কানপি' বা বড় নাচের পর্ব। আর শেষের দিন 'বানজাব কেকু' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এর ফলে তাঁর আত্মার দুঃখ-কষ্ট দূর হয় বলে তাঁরা মনে করেন।

কার্বিদের আর-এক উৎসব ‘রংকের’। রংকের হচ্ছে এক ধরনের কৃষিভিত্তিক স্থানীয় দেবতার (মোট দেবতা ১২) পুজো। সাধারণত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রাম ও চাষবাসের মঙ্গলের জন্য এই পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। বয়স্করা এই পুজোর অগ্রভাগে থাকেন। মেয়েদের কোন ভূমিকা নেই। তারা মূল অনুষ্ঠানের বাইরে থাকেন। রংকের সাত ভাবে করা হয়। তবে তার মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছে থান রংকের, আজো রংকের আর আরনালো রংকের। থান রংকের উৎসব বছরে এক বার যৌথ ভাবে পালিত হয়। আজো রকের পুজো রাত্রিবেলা হয়। তা একান্তই ব্যক্তিগত। প্রত্যেক কার্বি বাড়ির সামনে বেদি বানিয়ে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। ঈশ্বরের কাছে গ্রামের দুঃখ-দুর্গতি বিনাশের জন্য যৌথ ভাবে আর্জি জানানোর পুজো হচ্ছে আরনালো রংকের। দেবীকে তুষ্ট করার জন্য রংকের পুজোয় হাঁস, মুর্গি, পায়রা আর ছাগল বলি দেওয়া নিয়ম। সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করে হৈ-হুল্লোড় করা এর আর-এক বৈশিষ্ট্য। হুল্লোড়ের সময় ‘বৃষ্টি এসেছে, বৃষ্টি এসেছে’ বলে এ ওর গায়ে জল ছিটিয়ে কৃষির জন্য তাঁরা বৃষ্টি কামনা করেন।

আধুনিক কালের কার্বিরা দ্রুত গতিতে শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে চলেছেন। অসমে তাঁরা এক গুরুত্বপূর্ণ লোকগোষ্ঠী।

কার্বি লোককথা

বাপ-মরা ছেলে ও একটা পালকের কাহিনী

একটা ছেলে ছিল। তার নাম জাংরেসো। জাংরেসো তার মায়ের সঙ্গে থাকত। মা ছাড়া সংসারে তার আর কেউ ছিল না। তবে মা-ছেলেতে মিলে বেশ ভালোই ছিল। তাদের সংসারে অভাব ছিল, কিন্তু অশান্তি ছিল না। এই ভাবে জাংরেসো ছোট থেকে বড় হল। তারপর এক সময়ে সে বিয়ের উপযুক্ত হল। বিয়ের উপযুক্ত হতে সে একদিন একটি মেয়েকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে এল।

বিয়ের পরদিন থেকে তাদের ঘরে অশান্তি শুরু হল। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে বউ আর শাশুড়ির মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে দেখে জাংরেসো দুশ্চিন্তায় পড়ল। সে অনেক করে মা আর বউকে বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কেউই কোন কথা শুনতে চায় না। একবার সে ভাবে বউকে তাড়িয়ে দেবে। পরক্ষণে আবার ভাবে, না, সেটা ঠিক হবে না। বিয়ে-করা বউ, এ ভাবে তাড়ানো যায় না, উচিত নয়। আবার ভাবে, মা-কে ঘরে থাকতে দিয়ে বউ নিয়ে আলাদা হয়ে যাবে, দূরে কোথাও গিয়ে থাকবে। এতেও মনের সায় পায় না সে। মায়ের তা হলে খুব কষ্ট হবে। মা-কে কষ্ট দেওয়া ঠিক হবে না। তা হলে এখন কী করে জাংরেসো? কিছুই ভেবে পায় না। এ দিকে ঘরে অশান্তি বেড়েই চলেছে।

শেষে অবস্থা বেগতিক দেখে জাংরেসো একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কোথায় যায়? রাগে-দুঃখে লক্ষ্যহীন সে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে-হাঁটতে গিয়ে ঢোকে গভীর অরণ্যে। সেখানে তার সঙ্গে দেখা হয় টাকুন রেচোর সঙ্গে। টাকুন রেচো (শকুন) বনের মধ্যে সে কী করতে এসেছে, তা জানতে চাইল। জাংরেসো তখন তাকে তার সমস্যার কথা বলল।

'তুমি এক কাজ করো,' সমস্যার কথা শুনে টাকুন রেচো তার ডানা থেকে একটা পালক ছিঁড়ে তার হাতে দিয়ে বলল, 'তোমাকে এই পালকটা দিলাম। বাড়ি গিয়ে এটা চোখের ওপর রেখে তোমার মা আর স্ত্রীর দিকে তাকিও।'

জাংরেসো বাড়ি ফিরল সেই পালক হাতে নিয়ে। বাড়ি ফিরে দেখে তার মা ধান ভানছে আর বউ ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। পালকটা চোখের ওপর রেখে তাদের দিকে তাকাল সে। দেখল কী, তার বউকে একটা হরিণের মতো দেখতে লাগছে, আর মা-কে লাগছে একটা শূকরের মতো। সে অবাক হয়। বুঝতে পারে, এদের দু'-জনের স্বভাব আলাদা, তাই বনিবনা হচ্ছে না।

পরদিন সকালে জাংরেসো পথের ধারে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে, চোখের সামনে পালকটা রেখে লোকজনের আসা-যাওয়া দেখতে লাগল। কী আশ্চর্য! প্রত্যেকটা লোককেই মনে হচ্ছে এক-একটা জন্তু। কেউ গরু, কেউ ছাগল, কেউ মোষ, কেউ বা হরিণ। পালক সরালেই তাদের আবার স্বাভাবিক মানুষ মনে হচ্ছে। বিকেলবেলা বাড়ি ফেরার সময় জাংরেসো একটা মেয়েকে দেখতে পেল। রাস্তা দিয়ে একা-একা আসছিল সে। কী মনে করে সে পালকটা চোখের সামনে ধরল। দেখে, মেয়েটা বদলাচ্ছে না। পালক দিয়ে দেখলেও যা, খোলা চোখে দেখলেও তা। সে বুঝতে পারল এই মেয়েই প্রকৃত মানুষ। তার একটা মাত্র রূপ। যদিও সে দেখতে তত সুন্দরী নয়।

জাংরেসো তখন মেয়েটার কাছে গিয়ে তাকে তার দুঃখের কথা বলল। মেয়ে মনোযোগ দিয়ে সব শুনল। শুনে জানতে চাইল, সে কী করতে পারে তার জন্য। জাংরেসো বলল, 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, তুমি রাজি হয়ে যাও।'

মেয়েটি একটু ভেবে বলল, 'ঠিক আছে, আমায় বিয়ে করলে যদি তোমার দুঃখ ঘোচে, ঘরের শান্তি ফিরে আসে, তা হলে আমি রাজি আছি তোমায় বিয়ে করতে।'

জাংরেসো বাড়ি ফিরে তার বউকে বলল, 'আমি আর-একটি মেয়েকে বিয়ে করব। তুমি ইচ্ছে করলে আমার প্রথম পক্ষ হিসেবে থাকতে পারো, আর নয়তো বাপের বাড়ি ফিরে যেতে পারো।'

জাংরেসোর বউ বাপের বাড়ি ফিরে যাওয়াই মনস্থ করে সঙ্গে-সঙ্গে নিজের জিনিশপত্র গুছিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। জাংরেসো তখন সেই মেয়েকে বিয়ে করে আনল। নতুন বউ খুব ভালো। সে শাশুড়ির সঙ্গে মানিয়ে নিল। শাশুড়িরও এই বউকে খুব পছন্দ। ঝগড়াঝাটির ব্যাপারও আর থাকল না। জাংরেসো নতুন বউ নিয়ে সুখে ঘর করতে লাগল। তার মায়েরও আর কোন দুঃখ রইল না।

দুই অনাথ ভাইয়ের গল্প

তারা ছিল দু' ভাই। তাদেরও ছিল মা-বাবা। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাদের মা আর বাবা মারা গেলেন। মারা যাবার পর তারা উত্তরাধিকার সূত্রে পেল শুধু একটা গাই আর একটা পে ইংকি। পে ইংকি মানে শীতকালে ব্যবহারের গরম চাদর। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলল, 'ভাই, আমাদের তো আর কিছু নেই। এখন এ দুটোকেই ভাগ করে নিতে হবে। কিন্তু মুশকিলের কথা হল, এ দুটো ভাগ করা। আমি বলি কী, এ রকম একটা ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?'

'কী ব্যবস্থা?' ছোট ভাই জানতে চাইল।

'পে ইংকিটা তুই দিনের বেলা ব্যবহার কর, আর আমি করব রাতের বেলা।'

'বেশ তো, কোন সমস্যা নেই। কিন্তু গাইটা?'

'সে কথাও আমি ভেবে রেখেছি। তুই নিবি সামনের দিকটা আর আমি নেব পেছন দিকটা। তা হলেই মিটে যায় সমস্যা।'

ছোট ভাই আবার বলল, 'বেশ তো, আমার কোন আপত্তি নেই।'

'আমরা গাইটার মাঝ-বরাবর একটা দাগ কেটে দেব। দাগের এ পাশটা তোর, আর অন্য পাশ আমার। তারপর তোর অংশের দায়িত্ব তোর, আর আমার অংশের দায়িত্ব আমার। যার অংশে যা আয় হবে, তার পুরোটা সে-ই ভোগ করবে।'

ছোট ভাই অমত করল না। সব মেনে নিল। তারপর দু' ভাই মিলে দাগ কেটে গাইটাকে দু' ভাগে ভাগ করল। গাইয়ের মুখের দিকটা ছোট ভাইয়ের দিকে পড়ায় সে গাইটাকে খাইয়ে-দাইয়ে যত্ন করে পালতে লাগল। নিয়ম করে মাঠে বা এখানে সেখানে চড়াতে নিয়ে গেল। বড় ভাইয়ের সে সমস্যা নেই। তাকে কিছু করতে হয় না। পেছনের অংশের জন্য কিছু করার নেই।

কিছু দিন পর গাই একটা বাচ্চা বিয়োল। শর্ত অনুযায়ী সেটা বড় ভাইয়ের দখলে চলে গেল। গাই দুধ দিতে শুরু করল। সেই দুধও বড় ভাই পেল।

একদিন ছোট ভাই গরু চড়াতে গিয়ে গ্রামের চেনা এক বয়স্কা বিধবা মহিলার